ধর্মের উৎপত্তি

উত্তর পুরুষ

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মুল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ন অনুমান। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন "ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ"। কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোন ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষনের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাদির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়। এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য কোন ঈশ্বর কিংবা মহাপ্রভু মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে মানুষকে দিয়ে যাননি কোন অলৌকিক ক্ষমতা কিংবা কোন সংবিধান। মানুষ আদিম যুগ থেকে নিরাপত্তার কারণে ও বাঁচার তাগিদে নানাবিদ প্রচেষ্টা করেছে নিজ বুদ্ধিবলে। মানুষের এই প্রচেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োগ আজ পর্যন্ত টিকে আছে অব্যাহত গতিতে। প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা, শিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য দুর্বলের উপর আক্রমণ, বুদ্ধির বলে নানাবিধ কৌশল দ্বারা অপরকে পরাজিত করা, ভাষার সুন্দর প্রয়োগ দ্বারা শান্তি, ঐক্য ও ভালবাসা স্থাপন করা, এসমস্ত মানুষ আয়ত্ব করেছে নিজেদের বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ এবং তা থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা। আমরা যদি ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে নানা গবেষণা চালাই ও ইতিহাসের পাতা ওল্টাই তা হলে দেখতে পাবো ভয়, বুদ্ধি, স্বপ্ন, ভাষা, এবং কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এর পেছনে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হত। যেমন, ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভুমিকম্প, জলে ডুবা ইত্যাদি। এসব ছিল মানুষের জীবনের জন্য অত্যাধিক ভয়ের ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য কল্পিত পানির রাজাকে (বা দেবতাকে) খুশী করার জন্য পানিতে পুজো দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাই জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হত। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাট্তে কাট্তে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সুগন্ধিফুল, শস্য দানা ইত্যাদি। সুর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দুর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সুর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সুর্যটা খুব উপকারী সুতরাং সুর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে সে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সুর্যটা ভীষণ শক্তিশালী ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরী। সুর্যকে খুশ করলে অনেক শক্তি পাওয়া যাবে। এরকম মানষিক ধারণা থেকে সুর্যকে মানুষ নানা ভাবে পুজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সম্প্রদায় আগুনকে সুর্যের প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপুজা করতো। **এভাবে ভয়ের কারণে আত্ম-রক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপুজা বা ধর্মীয় আচরণ**। তদ্রুপ নানা যুক্তি তর্কের মধ্যে শক্তিমান প্রাণী হিসেবে হাতি, সিংহ ও ঈগলকে, আবার উপকারী জন্তু হিসেব গরু ছাগল ও ভেড়াকে অনেক আদিম শ্রেণীর মানুষ পুজো দিতে আরম্ভ করে। কোন কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় পুণ্যের জন্য এই নিরীহ প্রাণীগুলোর রক্ত মাংস দেব-দেবী কিংবা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। এভাবে বিভিন্ন রোগে মানুষ যখন আক্রান্ত হত তখন সে ভাবতো যে 'প্রকৃতি' বা যে 'প্রাণী' বেশী শক্তিশালী তার কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করতে হবে, তার গুণ-কীর্তন গাইতে হবে। কোন কোন গোষ্ঠীপতিরা ভাবতো নদী বা পানি শক্তিশালী, কেউ ভাবতো আগুন, কেউ ভাবতো সুর্য, কেউ ভাবতো বাতাস। এভাবে একেক শক্তিকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার বলে দেয়া হত পুজো। কেউ পুজো দিতে গিয়ে গান, নাচ এবং ছড়া কাটার ও প্রবর্তন করে। আবার কোন কোন গোষ্ঠীর ভক্তরা

পুজো দিতে গিয়ে চুপি চুপি ছড়া কাটতো, যাকে আমরা মন্ত্রপাঠ হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ধরে নিতে পারি। তারা মনে করতো এতে শক্তির অধিকারী অদৃশ্য রাজা খুশী হয়ে তাদের মঙ্গল করবে বা বিপদ আপদ থেকে মুক্ত করবে। এসব করতে গিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠি গুলোর মধ্যে পুজোর (ওরশিপ রিচুয়েলের) আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যদিও তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য এক।

এভাবে সময়ের ধাপে ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা কওমের মধ্যে তুলনামুলক ভাবে কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোকের আর্বিভাব হয়। তারা গোষ্ঠী বা কওমের মধ্যে নিজেকে নেতা বা অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এসব নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ওরসিপ বা পুজো-প্রার্থণার দায়িত্ব একাই নিত। তারা মুরব্বী বা অভিভাবক হিসেবে নিজেদের কওমের মধ্যে নানাবিধ দাবী খাটাতো। নিজ বুদ্ধি বলে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের অসুখ বিসুখ, জীন, ভুত ডাইনীদের নজর না লাগার জন্য নানাবিধ পথ্যাদি ও উপায় বাৎলে দিত। জীবনের অভিজ্ঞতায় ঝড় বৃষ্টি খরা ইত্যাদির ইঙ্গিত ও কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী খয়রাত করে গোষ্ঠীর মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সম্মান পেতো। এছাড়া বিপদ আপদ না আসার জন্য নানাবিদ তন্ত্র মন্ত্র, পুজো প্রার্থণা এসব ছিল তাদের মৌলিক দায়িত্ব। কোন গোষ্ঠীর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ হলে তার মীমাংশা কিংবা জোর পুর্বক কোন কিছু দখল করতে হলে (যেমন পানির উৎস, ফসলের ভুমিসত্ত্ব ইত্যাদি) তার আদেশ নির্দেশ সবাই মেনে নিত নির্দ্বিধায়। **এভাবে যুগ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরা হয়ে উঠলো এক শ্রেণীর অঘোষিত সমাজ সর্দার।** কোন দেবতার দ্বারা সাহায্য লাভ কিংবা কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে কখন কি ভাবে মোকাবেলা করতে হবে তার দায়ভাগ তাদের উপর গুরু দায়িত্ব হিসেব অর্পিত হলো। বিনিময়ে সেই ব্যক্তি সমাজের নানাবিধ সুযোগ সুবিধাও হাতিয়ে নিতে থাকলো। অতএব বিভিন্ন দৈবশক্তি কিংবা ঐশী শক্তির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লোকটি সমাজে একক প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর একখানা মন্দির কিংবা দেবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোন বাধা থাকবেনা। কি কাজে পাপ, কি কাজে পুণ্য, কোন কাজ না হলে শক্তিমান দেবতা বিপদ দেবেন এবং কি কি কাজে তিনি খুশী হয়ে পুরস্কার দেবেন তার সব অনুশীলন এই দেবালয় থেকে শুরু হলো। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে শুরু হলো আরেকটি নিরব সাম্রাজ্যের জয় যাত্রা। কালক্রমে এই দেবালয়ের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এসব দেবালয়ে এখন কুমারী বালিকারা এসে সেবা শ্রম দেবে। যে নারী সন্তান পাচ্ছেনা সেও নির্দিষ্ট সময়ে এসে গুরুর পরামর্শ অনুযায়ী নানাবিধ সেবা ও শ্রম দেবে। এভাবে সমাজের মধ্যে বাড়তে থাকবে তাদের সেবা ও কাজকর্ম। তাদের কাজ কর্মের কোন কৈফিয়ত বা জবাবদিহিতা কাউকে দিতে হবেনা। দিতে পারবেনা কেউ কোন অভিযোগ। তারা কেবল অদৃশ্য ইশ্বর ও দেবতাদের কাছে নিজেদের ভুল ত্রুটির কৈফিয়ত দেবে। যে লোকটি এখন এই দেবালয়ের সর্বেসর্বা, ভবিষ্যতে তার পুত্র, প্রপৌত্ররা হবে এর মালিক। যদি উপযুক্ত কেউ না থাকে তবে নিজ গোষ্ঠীর বা আত্মীয়ের মধ্য থেকে কেউ এসে ধরবে এর হাল। এখন কেউ যদি এসে লোকটিকে বলে "ওহে দয়ার ঠাকুর আমি তো ঠিক মত আরতি যোগে ফুল দিলাম, প্রণাম দিলাম, যজ্ঞ দিলাম তবু কেন আমার ক্ষেতে ফসল হলোনা?" লোকটি তখন চোখ বন্ধ করে বলে শোন গো মা, ফুলতো ঠিকই দিয়েছিলে কিন্তু ফুলটিতে কোন এক সময় ঋতুবতী মহিলার স্পর্শে হয়েছে অপবিত্র, এ কারণে ফসল ভাল হয়নি। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে একটা ত্রুটি বের করে এরা মানুষদের বোকা বানিয়ে রাখে। কেউ হয়তো এসে বললো আপনি আপনার শক্তিমান গো দেবতাকে বলুন "কেন দশ মাস থেকে আমার গাভীটা ভাল দুধ দিচ্ছেনা?" আচ্ছা বাবা তার আগে বল দেখি তোমার পরিবারে কে কে আছে ? তোমার সংসার চলে কি ভাবে ? পরিবারের কে কি করে? এরকম মামুলী কয়েকটি প্রশ্নের পর পুরোহিত লোকটি বললো "তৃতীয়া নক্ষত্রের রাত্রিতে আমি স্পেশাল প্রার্থণা শেষে তোমার গাভী ও দুধের জবাব জেনে নেব।" লোকটি খুশী মনে চলে গেল। কয়দিন পর যখন লোকটি পুণরায় তার গাভীর দুধ সম্পর্কীত জবাবটি জানতে চাইলো তখন পুরোহিত হাসতে হাসতে জবাব দিলেন 'দেখ বাবা জীবিশ্বরের (জীব জানোয়ারের ইশ্বর) কত দয়া।' তুমি একে একে তিনটি মেয়ে যখন পেলে,তখন মন থেকে শুধু ছেলে সন্তানের জন্য হাহাকার করেছিলে। দিয়েছিলে পুজো করেছিলে প্রার্থণা। সে কারণে ইশ্বর তোমার ভাগ্য থেকে দুধের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে বিনিময়ে ছেলে সন্তান করেছেন দান। কারণ তিনি জানেন দুধ অপেক্ষা তোমার ছেলে সন্তানের প্রয়োজন বেশী, সে কারণে তিনি তোমার প্রার্থণা কবুল করেছেন। পুরোহিতের কথা শুনে লোকটি খুশীতে বাগ বাগ হয়ে পরদিন নিয়ে এলো

কিছু মুল্যবান উপঢৌকন। এভাবে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কওমের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান লোকগুলো ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠলো। তারা এখন সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য নানাবিধ চেষ্টার কৌশল চালিয়ে যেতে লাগলো। বিনিময়ে তারা কিছুই চাহেনা। তারা চাহে মানুষের আন্তরিক আশীর্বাদ ও কর্মের আন্তরিক সমর্থন। আর এই সমর্থনটা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি যা নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল হাতিয়ার। এ উদ্দেশ্যে তারা শোষিত মানুষদের মুক্তির জন্য করেছে নানাবিধ প্রচেষ্টা। অত্যাচারী রাজাদের তারা ভয় দেখিয়েছে পরকালের। অপর দিকে শোষিত মানুষদেরকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঘটিয়েছে ঐক্য এবং ইশ্বরের দাবী হিসেবে নায্য পাওনার দাবী করেছে শাসকবর্গদের কাছে। এতে অনেক দাবী আদায় হয়েছে। আবার কোথাও তা নিয়ে বেঁধেছে যুদ্ধ। এসব যুদ্ধের ফলে অনেক শাসকদের জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, তারা বুঝতে পেরেছে নির্যাতীতেরাও ধর্মের ডাকে ঐক্য স্থাপিত করে মানুষের অধিকার আদায় করতে জানে। যারা অতি মাত্রায় ধূর্ত তারা ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বিলাস বহুল জীবনকে ঘৃণা করেছে। যার ফলে তারা সাধারণ দাসদের ও শ্রমজীবি মানুষের স্তরে নেমে এসে একাত্ম হয়েছে। তাদের ভিতরের প্রচন্ড আকাঙ্খা ও সবুজনক্সা ছিল এরকম; একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেলে চিরজীবন তার নাম অক্ষুন্ন থাকবে। ইশ্বরের গুণকীর্তন করার সাথে সাথে তার যশ খ্যাতির গুণকীর্তন ও করা হবে নিঃসন্দেহে। ধর্মের সমর্থকরা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে আজীবন। তার নিজের গোষ্ঠীর গৌরব উজ্জ্বল দিক ইতিহাসে অঙ্কিত হবে আর রক্ত পঙ্কিল দিক কালের গহব্বরে হারিয়ে যাবে। এভাবে গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা স্বঘোষিত ইশ্বরের প্রতিনিধিরা সময় বা কালের স্রোতে নিজেদেরকে সমাজসেবী হিসেবে করেছে প্রতিষ্ঠিত। এবং তা করেছে নিজ এলাকায়, নিজের সমাজে। যেখানে সামাজিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ছিল ভরপুর। কিন্তু এই সমাজ সেবা করতে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের মাথায় নানাবিধ নিয়ম ও আইন কানুন বাধ্যতামুলক ভাবে বেধে দেয়া একটি স্বেচ্চাচারীতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইশ্বরের নামে নিজের মগজ থেকে তৈরী করা আইন সব সমাজের জন্য সব যুগে কখন ও উপযোগী হতে পারেনা। এটা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে পরাধীনতার একটি শৃঙ্খল। পৃবীর সবকিছু যেমন চলমান, সমাজ ও তেমনি চলমান। সমাজ কখনও স্থবির নয়। হাজার হাজার বৎসরের পুরানো সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমান সামাজিক অবস্থার মিল কখনও এক হয়না। তাই যদি হত তাহলে মানব সমাজে "সভ্যতার ক্রমবিকাশ" বলে যে শব্দটি আছে এবং ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা বর্তমানে যে অবস্থানে পৌচেছি তা কখনও সম্ভব হতনা। সুতরাং ধর্ম সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে ধারণা দেয়া কিংবা 'কমপ্লিট কোড অফ লাইফ' আখ্যা দিয়ে মানুষকে "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" বুঝ দেয়া একটি ভুল ধারণা। তাই যদি হয় তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ কি এত বোকা যে তারা এত আধুনিক শিক্ষা, এত গবেষণা, এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত সমাজ তত্ত্ব, এত সংগঠন, এত আইন শাস্ত্র, এত কোর্ট-কাছারী নিয়ে বেহুদা ঘাটাঘাটি করছে ?

ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতে এবং ইউরূপের গ্রীস ও ইতালীতে ধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। মধ্য প্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি গোত্রেই কেউ না কেউ সময়ের স্রোতে ইশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। এর কারণ এবং অনুসন্ধান হিসেবে যে সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় তা হলো, 'কয়েক বৎসর পর পর পৃথিবীতে একজন ইশ্বর প্রতিনিধি আসবেন' এরকম একটি ধারণা মানুষের মনের মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান থাকতো'। দ্বিতীয়টি হলো 'মানুষের নিদ্রাজাত স্বপ্ন'। এর দু'টি ব্যাখ্যা আছে। প্রথমটি হলো সেই আদি যুগে মানুষ যখন স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ বিষয়বস্তু দেখতো তখন সে বিশ্বাস করতো ঘটনাটির মধ্যে সে নিজেই জড়িত। সে নিজেই বিভিন্ন যায়গায় ছিল। অথচ সজাগ হয়ে বুঝতে পারে সে তার গুহার মধ্যে অথবা কুড়ে ঘরে ঠিকই শুয়ে আছে। তাহলে সে বাইরে গেল ক্যামনে ? এত কিছু দেখলো ক্যামন করে ? বিষয়টি তৎকালীন আদিম মানুষদেরকে দারুন দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। তারা তখন ভাবতে থাকে তাহলে মানুষের মধ্যে খুব সম্ভব দু'টি আত্মা আছে। একটি আত্মা রাত্রি বেলা ঘুমের মধ্যে যাওয়া আসা করে, ঘুরে বেড়ায়। আর অপর আত্মাটি সব সময়ে সঙ্গে থাকে। সব সময় যে আত্মাটি থাকে সেটি একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরত আসেনা। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে অদৃশ্যে উদাও হয়ে যায়। মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে মুখ ও বুকের যে অবস্থা হয় এতে অতীতের মানুষ অনুমান করেছিল আত্মা জিনিসটি বুকের ভেতর থাকে। আর মৃত্যুর সময়ে সেটি মুখ দিয়ে অতি কষ্টের সাথে বের হয়। তৎকালে হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম সম্পর্কে

মানুষের উন্নত ধারণা ছিলনা। তৎকালীন আদিম সমাজের শুরু থেকে বুদ্ধিমান যাযক বা পুরোহিত সম্প্রদায় মানুষকে এই ধারণা দিয়ে আসছে যে আত্মার মৃত্যু হয়না। যে ধারণা আজো বহাল তবিয়তে ঠিকে আছে সারা পৃথিবীতে। অতএব যাযক বা পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের (ঐশ্বরীক) প্রতিনিধিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলে বেড়ালো যে পৃথিবীতে তুমি যত কিছু গোপনে কিংবা অন্যায় ভাবে করে থাকো তা সকল দৈব শক্তির অধিকারী ঈশ্বর বা ঈশ্বরগণ জানেন। এবং মৃত্যুর পরে শাস্তি হিসেবে তা তোমার আত্মার উপর আরোপিত হবে। তারা উদাহরণ স্বরূপ স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কেউ কেউ সেই আত্মা থেকে আবার দেহ সৃষ্টি করে দেহের উপর শাস্তি আরোপ করা হবে বলে নিশ্চয়তা দেন। কেউ কেউ মৃত্যুর পর আত্মা থেকে পুর্ণজন্ম লাভ করে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পশুতে পরিণত হবার কথা উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন সেই আত্মা ভুত প্রেত বা পিশাচ হিসেব পৃথিবীর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে। ইসলাম ধর্মের হাদীসে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর যখন মানুষকে কবরে রাখা হবে। তারপর আত্মীয় স্বজনগণ চল্লিশ কদম দুরে সরে আসার পর, কবরস্থানে দু'জন অদৃশ্য ফেরেশতা এসে সেই মৃত মানুষের ভিতরে রুহ বা আত্মার সংযোজন ঘটাবেন। মৃত মানুষটি তখন জেগে উঠবে এবং ভয়ানক চিৎকার করবে। সেই চিৎকার কেবল মাত্র কিছু পশু পক্ষী ছাড়া কেউ শুনবেনা। তারপর সেই মানুষটিকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। সেই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব যারা দিতে পারবে তারা শান্তির সাথে পুণরায় ঘুমিয়ে পড়বে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। আর যারা সঠিক জবাব দিতে পারবেনা তাদের আজাব শুরু হয়ে যাবে। সেই আযাব (শাস্তি) হতে পারে আত্মার উপর কিংবা দেহের উপর। তবে অধিকাংশের মতামত হলো দেহের উপর। এই আজাবের কোন ক্রন্দন বা চিৎকার কোন মানবজাতি শুনতে পাবেনা। এই গল্পের শেষে আমি একজন মৌলভী সাহেবকে হাস্যমুখে বলেছিলাম তাহলে ইসলাম ধর্ম আর্বিভাবের পুর্বে পৃথিবী থেকে যে কোটি কোটি মানুষ মারা গেল তারা কেউতো এই পাঁচটি প্রশ্ন সম্পর্কে কোন প্রস্তুতি নিয়ে মারা যায়নি। অতএব তারা নিশ্চয়ই ফেল করবে এবং তাদের অবস্থা তখন কি হবে? মৌলভী সাহেব তখন জবাব দিয়েছিলেন; যেহেতু ইসলাম ধর্ম তখন আসেনি সেজন্য সেই সময়কার ধর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। জানিনা পৃথিবীর ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণ তাদের লোকদের সেই পাঁচটি প্রশ্ন ও জবাবের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কিনা ।

'নিন্দ্রাজাত স্বপ্নের' দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির প্রতি আমার বিশ্বাস, মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা প্রবল উষ্ঞ আবহাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমান খেজুর, আঙ্গুর, বেদানা ও এই জাতীয় ফলের রস পান ও ভক্ষণ করতেন। পান করতেন বকরী ও উটের দুধ।এতে নিদ্রা হত বড়ই গভীর ও স্বপ্নময়। তারা নানাবিধ স্বপ্ন দেখতেন। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে সবুজ গাছ-গাছালি, সবুজ মাঠ প্রান্তর ও নদ নদীর বড় অভাব ছিল, অভাব ছিল পাখীর কল-কাকলী ও মেঘ বৃষ্টির। যে কারণে রাত্রি কালীন স্বপ্নের আমেজ ভোরবেলা তাদের মন থেকে হারিয়ে যেতনা। কারণ ওখানে সবুজ দৃশ্যাবলী ও নদ নদীর বদলে বিদ্যমান ছিল গনগনে সুর্যের তপ্ত আকাশ আর নীচে ছিল উত্তপ্ত মরুভুমির বালুরাশি। সুতরাং দিনের বেলাতে ও তারা বিগত রাত্রির স্বপ্নটি নিয়ে ভাববার অবকাশ পেতেন। এই স্বপ্ন কেন দেখলো ? স্বপ্নের রহস্য কি ? তা হলে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বলতে চাইছে। এরকম শত শত প্রশ্ন তার মনকে ভাবিয়ে তুলতো। সে ভাবতো নিশ্চয়ই সেটা অদৃশ শক্তির সাথে তার অদৃশ্য আত্মার খেলা। অতএব সেই ব্যক্তিটি মানুষের ভাল মন্দ, বিপদ আপদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয় আসয়ের সাথে স্বপ্নের কাল্পনিক অঙ্ক মিলাতে চেষ্টা করে। কিছু কিছু মিলে ও যায়। এতে তার সাহস এবং উৎসাহ উভয়ই বাড়তে থাকে। যার ফলে সে নিজে অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধি হতে যাচ্ছে বলে মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং তৎকালীন প্রচলিত কিছু কিছু ঔষধ পত্রকে অনুকরণ করে রোগীদের সেবা ও পথ্য বাৎলে দিতে থাকে নিজ বুদ্ধির জোরে। এতে কিছু কিছু কৃতকার্যতা আসে। তার সাথে পানি পড়া, ঝাড় ফুক, এটা ওটা মন্ত্র আওড়িয়ে মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য নানাবিধ ফন্দি ফিকিরের চেষ্টাও চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। মাতৃভাষায় কথা বলার মধ্যে বিনয় ও বাকপটুতা তাদেরকে করে তুলে অতি আত্ম-বিশ্বাসী। ধীরে ধীরে দুর দুরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকে আরোগ্য লাভের আশায়, কেউ আসে চুরির উট বকরী ফিরে পাবার আশায়। সন্তানহীনা নারী আসে সন্তান পাবার কামনায়। কেউ আসে ভাল ফল ও শস্যতে বরকত হবার আশায়। কেউ কেউ আসে ঝগড়া বিবাদের একটা ফয়সালা করার জন্য মধ্যস্ততা হিসেবে ভুমিকা নেয়ার। কেউ কেউ আসে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তায়। এভাবে লোকটি যখন জনপ্রিয় হতে শুরু করে তখন একদিন সুযোগ বুঝে নিজেকে অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা

দিয়ে দেয়। শুরু হয় তার কথায় ও কাজে কৌশল প্রয়োগের নানাবিধ সুযোগ ও সতর্কতা। তখন নিজ কওমের বা গোষ্ঠীর লোকেরা গর্বিত হয়। তাকে তখন সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এভাবে ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মানুষের গোড়া পত্তন হয় পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে। ইতিহাস আমাদের সাক্ষী দেয় হাজার হাজার কাল ও শতাব্দীর সিড়ি বেয়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের ভয়, কৌতুহল ও আপন অস্তিত্বকে জানার প্রয়োজনে। ইশ্বরের প্রয়োজনে নয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম সংঘাত নাকি সমন্বয় এর একটি সিদ্ধান্তে যাবার আগে আর ও কিছু কথা না বলে সিদ্ধান্তে যেতে পারছিনা । এ জন্য প্রিয় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে সামান্য বিরক্ত করবো বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কথা হল পৃথিবীতে এত গবেষণাঘার, এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত আবিষ্কার, এত আমুল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে আদম ও ইভ নামক দু'জন মানুষের স্বর্গ বিচ্যুতি থেকে পৃথিবীতে মানুষ ও ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় পৃথিবীর মানুষ এখনও বিজ্ঞান বুঝেনা। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলোকে তারা মানুষের এক ধরণের কারসাজি হিসেবে বিশ্বাস করে। এই কারসাজি দ্বারা তারা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করে মুনাফায় ধন-দৌলত আয়ত্ব করে। তারা আরও বিশ্বাস করে এসমস্ত তথ্য ও আবিষ্কারের সাথে ইশ্বরের কিংবা পরলৌকিকতার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে শোষণ, অত্যাচার ও যুদধ বাধিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইহ জগতে ভোগ-বিলাসের মদতদানকারী এক বিশাল দানব। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিশাল অবদান মানব সমাজের জন্য যে কি অপরিসীম আশীবাদ তারা এখনও বুঝতে চান না। ধর্মীয় গল্পগুলি বা অলৌকিক কেচ্ছা কাহিনীগুলো সব সময়েই যে অতিরঞ্জিত অর্থাৎ তিলকে তাল করা কিংবা মানুষকে বিশ্বাসী বানানোর জন্য খোঁড়া যুক্তির সমাবেশ তা তাদেরকে বুঝানো যায়না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এসব গল্পের সৃষ্টি হতে পারে তা তাদের কিছুতেই বোধগম্য করানো যায়না। হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, বিশাল তিমি মাছের পেটে বেঁচে থাকা, মৃত মানুষকে জীবিত করে তুলা, সাত আসমান ভ্রমন ইত্যাদি গল্প গুলোর সাথে বিজ্ঞানের যে ছাত্র বায়োলজী, ক্যামেষ্ট্রি ও ফিজিক্স পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝতে পারে সেই ছাত্রটিও তার বিবেক থেকে কখনও এসব বিশ্বাস করতে পারেনা। এসবে বিশ্বাসী না হলে সমাজে এবং পরিবারে তার খাদ্য ও বাসস্থান মিলবেনা। একারণেই সে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় প্রভাবের কারণে সে মগজ ধুলাই এর শিকার। নিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনা নিয়ে এসব ধর্মীয় গল্পের সমালোচনা লিখলে এটা "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত" অপবাদ দিয়ে তারা সবাই মহা হুলস্থুল কান্ড ঘটাতে চান। ধর্মের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনা সর্বদাই দুর্বল এবং পরনির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব স্বাধীন যুক্তি সর্বদাই পাপের ভয়ে হয় মৃত নয়তো ম্রিয়মান। সেই যে হাজার হাজার বৎসর আগে ধর্মীয় অবতারগণ যা বলেছিলেন সেটাই তারা আচ্ছা করে গাঁট বেধে মনের মধ্যে পুতে রেখেছেন। স্েই গাঁট তারা কখনও খুলে দেখতে চান না ঈমান নষ্ট হবার ভয়ে। ধর্মীয় কেতাবগুলোতে উল্লেখ আছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ 'আদম' কে সৃষ্টি করার পুর্বে স্বয়ং বিধাতা তার ফেরেশতাগণের সাথে যুক্তি করেছিলেন পৃথিবীতে মানুষ পাঠানো হবে কি হবেনা ? তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যাবে ওখানে স্বয়ং আল্লাহ বা বিধাতা ফেরেশতাগণের মতামত নিয়ে 'গণতন্ত্রের' সুচনা করেছিলেন। অথচ পৃথিবীতে তারা গণতন্ত্র মানতে চান না। তারা ধর্মীয় কিতাবের একনায়কতন্ত্রী আইন কায়েম করতে চান। ধর্মীয় উক্তি বা হাদীসগুলোকে বিধাতার আইন হিসেবে মেনে নিয়ে মানুষের স্বাধীনতা ও মানুষের সময় এ দু'টো কে নির্মুল করতে অতিশয় উৎসাহী। নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে বলছি কোন দেশের গণতন্ত্রের অনুকরণ নয়, বরং যা একটি দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর তার উপর জনগণের অধিকাংশের মতামতে বিল পাশ করে যদি আইন তৈরী হয় তবে সেটি ধর্মীয় আইনের চেয়ে উত্তম হবেনা কেন ? সেটি আমি পাঠক সমাজকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। উপরোক্ত নিবন্ধের আলোচনা শেষে আমি এটা বলতে চাই বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষার যুক্তি প্রমাণে ও বাস্তববাদীতায় প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্ম জীবন যুক্তির কল্পনা ও অদৃশ্যের বিশ্বাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম নগদ অপেক্ষা বাকীতে অধিক বিশ্বাসী । সুতরাং এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন একটি কঠিন ব্যাপার, তবে নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে (এথিক্স) বিষয়টি আংশিক গ্রহণযোগ্য।